OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 171
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 163 - 171
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কমলামঙ্গল কাব্য পরম্পরা ও যাদব দাশের ‘লক্ষ্মী পাঁচালী’

অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID : banerjeearghya2014@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Short-studied Mangalkavya, Kamala, Lakshmi, Vows, Pnachali, Dhanyapuja, Spiritualism, Philosophy, Society and Relevance.

Abstract
The epic poem which was sheltered pastoral life and spiritualism during the medieval period of thirteen century to eighteen century of Bengali literature is called Mangalkavya. Within the long five hundred years of literary stream, the essence of Bengali culture was displayed. We know that the Mangalkavyas are originated from ancient the tale and tories. This belief is the main source of the discovery of the Aryatoro deities of Mangalkavya. Local and ancient deities were praised in some prevalent tales tories in Bengali household. Among this tales Kamalamangal is one of them, in appraisal tale of goddess Lakshmi. The rituals prevalent in women society reflects the acts of Mangalkavya. The rituals are essential in religious ceremony. The rituals were celebrated in ancient and conservative tradition, which is evident in Mangalkavya. Habitually, the Mangalkavya is derived from this Rituals. The rituals are enriched in Mangalkavya. That is why it reveals the ancient nature of the rituals. And the written form of rituals is called Pnachali. In medieval period the epic poem was called Pnachali. But eventually this tales took a distinguished form. The appraisal tale of goddess Lakshmi is depicted in Lakshmi pnachali. The Kamalamangal is originated from the appraisal epic poem of goddess Lakshmi. We will discuss further about Lakshmi's character of Kamalamangal of Yadav Das' 'Lakshmi Pnachali'. Kamala or Lakshmi is one of the most important Deity of Hindu Pantheon. She is widely famous in both Hindu and Buddhist culture. We know deity Lakshmi as the wife of God Vishnu, the daughter of Parvati and Shiva or the daughter of Sea-God. Her bahana (charioteer) is Owl. Lakshmi is the goddess of spiritual wealth, fertility, prosperity and beauty. The significance of the goddess is also known from the Kojagori Lakshmi puja and from ancient tales. Kamalamangal has taken part in ancient tales and stories. Our poet Yadav Das' "Lakshir Pnachali" also describes the name of the deity, appraisal of goddess and the method of Lakshmi's worship. Beside this the poem also describes that by listening the devotional tale of the goddess we can gain wealth, prosperity and fame. Poet Yadav Das highlighted the morals of women through goddess Lakshmi. Yadav Das also portrayed the anger form of Lakshmi like goddess Manasa and

Chandi and the various trickeries of the goddess is illustrated in the epic poem by the poet.

Discussion

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পল্লীর লোকায়ত জীবন ও ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল আমরা তাকে মঙ্গলকাব্য বলে থাকি। দীর্ঘ পাঁচশো বছরের সাহিত্য স্রোতের মধ্যেই বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপ আভাসিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলি থেকে শুরু করে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে মঙ্গলকাব্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাতে আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন –

> "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[১]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল –

> "বাংলা দেশে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা-প্রচার ও ভক্তকাহিনী অবলম্বনে যে ধরণের সম্প্রদায়গত, প্রচারধর্মী ও আখ্যান মূলক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।"[২]

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মতে মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞাটি হল -

> "মঙ্গলকাব্যসমূহের আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসরণ করে বলা চলে, যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য কীর্তন, এমনকি শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতটিতে হয় অমঙ্গল; যে-কাব্য মঙ্গলাধার, এমনকি, যে কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় - তাই মঙ্গলকাব্য।"[৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞাটি হল -

> "যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, - যে গান 'যাত্রা' বা মেলায় গীত হয় (হিন্দিতে মঙ্গল শব্দের অর্থ মেলা, যাত্রা বা গমন) তা-ই মঙ্গলকাব্য।"[৪]

এই মঙ্গলকাব্যর আখ্যান কতগুলি স্বতন্ত্র পালায় বিভক্ত। সাধারণত আট দিন ধরে দিবা ও রাত্রি মোট ষোলোটি পালায় কাহিনি গীত হত। আমরা জানি 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' আট দিনের ষোল পালায় গাওয়া হত আর 'ধর্মমঙ্গল' বারো দিনে চব্বিশ পালায় গীত হত। আবার কখনো কখনো 'মনসামঙ্গলে'র ক্ষেত্রে দীর্ঘ একমাস ধরে গীত হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে এই মঙ্গল গান গাওয়ার উদ্দেশ্য কবি, কাব্য পাঠক বা কাব্যশ্রোতার মঙ্গলসাধন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর চরিত্রের মধ্যে মূল যে উদ্দেশ্য কাজ করত তা হল ভীতি প্রদর্শন বা কৃপা বিতরণের মধ্যে দিয়ে কৌশলে আদায় করার এক প্রচেষ্টা। এই প্রেক্ষিতে দেব-দেবীরা, কবি বা পৃষ্ঠপোষককে স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য কথা রচনা করার আদেশ প্রদান করতেন। আর এই আখ্যান রচনার প্রেক্ষাপটটিও সেই সঙ্গে প্রাধান্য পেত কাব্য মধ্যে— সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত সেই সূত্রে উঠে আসত।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা দেবতা-মানুষের দ্বন্দ্ব ও সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতটি লক্ষ্য করি। কবিরা এক অপূর্ব আখ্যানকে রূপদানের মধ্যে দিয়ে জীবন রসে জারিত করে উপভোগ্য করে তোলেন। এই মঙ্গলকাব্য রচনার পিছনে যে কারণ বিদ্যমান ছিল তা হল- তুর্কি আক্রমণ, পৌরাণিক ও লৌকিক সমন্বয়, হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় রোধ, বাংলার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক চর্যা। এহেন পরিস্থিতিতে এক একজন দেব-দেবী আবির্ভূত হয়ে আশু বিপদ থেকে আর্ত মানুষকে উদ্ধার করেন। এটাই ছিল মূল চিত্র। ভারতবর্ষে আর্য ও প্রাগার্য সংমিশ্রণের সূত্রে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল।

এই আর্য ও প্রাগার্য বিভেদের মূলে ছিল পুরুষতান্ত্রিকতা ও মাতৃতান্ত্রিকতা। আর এই বিভেদের সাম্যাবস্থায় দেখা দিল মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা। দীর্ঘ সময়পর্ব ধরে বর্ণ হিন্দুরা তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষ তথা দেবতাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তুর্কি আক্রমণের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত বর্ণ হিন্দুরা সকলে একত্রিত হল। আর তখনই পুরাণ চর্চা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে যে পুনরুজ্জীবন ঘটল তার মধ্যে দিয়ে উদ্ভব হল মঙ্গলকাব্য।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মঙ্গলকাব্য ধারাটিকে মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভাজন করতে পারি- ক. প্রধান মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল; খ. অপ্রধান মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ কমলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল প্রভৃতি। জনপ্রিয়তা ও প্রাচীনতার ভিত্তিতে এই বিভাজন আলোচকগণ করে থাকেন। স্বভাবতই এই অপ্রধান বা স্বল্পচর্চিত মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠকসমাজে তুলনায় কম পরিচিতি পেয়েছে। তবে মঙ্গল কাব্য গুলিতে যে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভাজন (অর্থাৎ বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখন্ড ও নরখণ্ড) পরিলক্ষিত হত; যা প্রধান মঙ্গলকাব্যে দেখা গেলেও অপ্রধান শ্রেণির মঙ্গলকাব্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা যায় না। এই বাঁধা ধরা ছকের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কবিরা নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন পালা রচনার সময়। আর সেই সূত্রে আরও একটি বিষয় আমরা স্মরণে রাখবো সেটি হল কাব্যগুলি রচনার ক্ষেত্রে কখন কখন দেখা গেছে পুরাণাশ্রয়ী দেবীর আরাধনার বিবরণ আবার কখনো দেখা গেছে লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীনতর দেব-দেবীর পুজোর ইতিবৃত্ত।

আমরা জানি মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম প্রাচীন ব্রতকথা ও উপকথা থেকে। এমন ধারণা থেকেই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আর্যেতর দেব-দেবীর সন্ধান করা হয়েছে। স্থানীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে পাঁচালী আকারে কতকগুলি কাব্য বাঙালির ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। এই পাঁচালী আকারে রচিত দেবী লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্তন জ্ঞাপক কাব্য হল - 'কমলামঙ্গল'। স্ত্রী সমাজে প্রচলিত ব্রতগুলির ছাপ পড়েছে মঙ্গলকাব্যে। এই ব্রতগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অপরিহার্য। ব্রতকথাগুলি প্রাচীনতর ও রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করেই পালিত হত। যার প্রকাশ মঙ্গলকাব্যে পড়েছে। স্বভাবতই ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা ও বিষয় গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ব্রতকথাগুলির বিনির্মান হয়েছে। ফলে এখানে ব্রতের প্রাচীনত্বের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। আর এই ব্রতকথার লিখিত রূপ হল পাঁচালী। মধ্যযুগে আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই পাঁচালী বলা হয়। তবে ধীরে ধীরে ব্রতকথা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। দেবী লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথাকে লক্ষ্মীর পাঁচালীর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বলা যেতে পারে দেবী লক্ষ্মীর এই আখ্যানমূলক পাঁচালী কাব্য থেকে সৃষ্ট 'কমলামঙ্গল' কাব্যটি। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীর ব্রতকথা ও পাঁচালী গুলি নিতান্ত ছোট রচনা। তিনি 'লক্ষ্মীকথা' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা হিসাবে শিবানন্দ কর, দ্বিজ পঞ্চানন, ভরত পন্ডিত, শঙ্কর, দ্বিজ বসন্ত, যাদব দাশ, ধনঞ্জয় প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৈকুণ্ঠ মাঝি সংকলিত 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য কেবলমাত্র শিবানন্দ করের 'লক্ষীমঙ্গল' কাব্যের প্রচার লাভের কথা জানিয়েছেন। এছাড়াও 'কমলামঙ্গল' কাব্য রচয়িতা হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য দয়ারাম ও নিত্যানন্দের নাম। আমরা 'কমলামঙ্গল' বা 'লক্ষ্মী চরিত্র'র বিষয়ে যাদব দাশের 'লক্ষ্মী পাঁচালী' কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হব। তার আগে দেবী লক্ষ্মীর স্বরূপ সম্পর্কে দু-চার কথা উল্লেখ করব।

কমলা অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মী হিন্দু ধর্মের অন্যতম দেবী। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে তার সর্বব্যাপী বিস্তার। আমরা দেবী লক্ষীকে বিষ্ণুর স্ত্রী, পার্বতী ও শিবের কন্যা বা সমুদ্র কন্যা রূপে দেখি। তাঁর বাহন পেঁচা। তিনি ধন-সম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, উর্বরতা, ধন-ধান্য, শ্রী ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। দেবী লক্ষ্মী সম্পর্কে আমরা ঋকবেদ, স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে নানা তথ্য জানতে পারি। তবে বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্মীর উল্লেখ নেই। সেখানে শ্রী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। আর অন্যান্য বেদে লক্ষ্মীর কথা থাকলেও তা দেবী হিসাবে উল্লেখিত হয়নি। ঋকবেদের ৫ মণ্ডলের শেষে খিল সূক্তস্থ পঞ্চদশ ঋক্ মন্ত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে –

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।।
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥"[৫]

এখানে বর্ণিত শ্রী বা লক্ষ্মী শুধু সম্পদরূপিনী এবং কান্তিরূপিনী নয়। এর মধ্যে দিয়ে দেবীর পৌরাণিক উপাখ্যানের কথাও লুকিয়ে আছে। 'পদ্মপুরাণে'র উত্তর খণ্ডে এই শ্রী সূক্তের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় –

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং বিষ্ণোরনপগামিনীম্॥
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানান্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥
এবং ঋক্-সংহিতায়ান্ত স্তুয়মানা মহেশ্বরী।"[৬]

(২২৭/২৯-৩১)

বিষ্ণুপুরাণ (১/৯/১০০) বা পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৪/৫৮) এ দেখা যায় সমুদ্রমন্থনে বিকশিত কমলে ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীর আবির্ভাব। এরপর দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তের দ্বারা তাঁর স্তব করেছিলেন।

বাল্মীকির রামায়ণেও শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ আছে। দেবী লক্ষ্মী সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে জানা যায় যে প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। স্কন্দগুপ্তের সময়কালে জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণুস্তোত্রে বিষ্ণুকে কমলাবাসিনী লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর পুজো প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হয়েছিল। এই সম্পর্কে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন –

> "শ্রী বা লক্ষ্মী এবং তাঁহার পূজার প্রাচীন যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্নীরূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত যুক্ত তবু এই বিষ্ণু-শক্তি রূপ বা বিষ্ণু-পত্নী রূপই তাঁহার মুখ্য পরিচয় নহে; তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা অন্ততঃ বাঙলা দেশের প্রত্যেক গৃহেই করা হইয়া থাকে; জন-সাধারণের ভিতরে লক্ষ্মীর এই বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুপত্নী রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও একেবারেই গৌণ; তিনি আপন শক্তি ও মহিমাতেই বরণীয়া। 'লক্ষ্মীর আসন' বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত; এই আসনে দৈনন্দিন জলঘট-প্রতিষ্ঠা এবং সন্ধ্যায় ধূপদীপ দেওয়া হিন্দু নারীর অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইহা ছাড়া বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর ব্রতকথা বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুরই ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই ব্রতকথার আরম্ভে এবং শেষ প্রণামে বিষ্ণুর সাহচর্য জুড়িয়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ব্রতকথা-মধ্যে লক্ষ্মী স্বতন্ত্র দেবী।"[৭]

ভাগবত থেকে জানা যায় দেবী লক্ষ্মী খ্যাতি ও মহর্ষি ভৃগুর কন্যা। বিষ্ণুপুরাণেও সে কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ভৃগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী'র জন্মকথা পাই। তবে ভৃগু কন্যা রূপে লক্ষ্মী নামের উল্লেখ সেভাবে পাওয়া যায় না, সর্বত্রই শ্রী'র কথা উল্লেখিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে ঐশ্বর্যের ও শান্তির দ্যোতক লক্ষ্মীদেবী। দেবী লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, মা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা, জলধিজা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, দুগ্ধাব্ধিতনয়া, ক্ষীরসাগরসূতা প্রভৃতি নানান নামে পরিচিতা। তিনি ত্রিলোকের শ্রীলক্ষ্মী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোকেই তিনি বিরাজমান। ধন-ধান্য শ্রী ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী তাই শুদ্ধ সত্ত্বরূপা। দশমহাবিদ্যার দশম মহাবিদ্যা কমলা দেবী হলেন মা লক্ষ্মী –

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।।"[৮]

(চামুণ্ডাতন্ত্র)

মা লক্ষ্মী কমল আসনে থাকেন। কমলা হল সর্বাত্মক বিকাশের প্রতীক।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 171
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি ইন্দ্রের সম্পত্তি হিসেবে, স্বর্গ লক্ষ্মী রূপে, পাতাল ও মর্ত্যের রাজাদের কাছে রাজলক্ষ্মী রূপে, গৃহীদের গৃহে গৃহলক্ষ্মী রূপে, সমস্ত শাস্ত্রে, বস্ত্রে দেব প্রতিমায় মঙ্গলঘটে শোভা হিসাবে অবস্থান করেছেন। তাঁর আরাধনা করা হয় শান্তভাবে। বলাবাহুল্য লক্ষ্মী দেবীর পুজোয় বলিদান নেই। পাল যুগে নির্মিত বিষ্ণু মূর্তিগুলির বেশির ভাগ দেখা যায় বিষ্ণুর ডান দিকে লক্ষ্মী এবং বামদিকে সরস্বতী বিরাজমান। এই মূর্তিগুলিতে লক্ষ্মীরূপ আমাদের পরিচিতি রূপটি থেকে স্বতন্ত্র। এই সূত্রে আমরা দেশীয় ইতিহাসে দেবীর বিবর্তনের রূপটি অনুধাবন করলাম।

'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র' নামের গ্রন্থগুলি বটতলা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হত। আর তাতে প্রতি মাসের ব্রতকথা সহ জগৎশেঠের পালা, বিনন্দ রাখালের পালা, তিলোত্তমা পালা, চম্পাবতীর পালা, রম্ভাবতীর পালা, রতা কাঠুরিয়ার পালা, লক্ষী মোটকার পালা ইত্যাদি স্থান পেত। এসব পালাতে বিচিত্র সব কাহিনি আশ্রয় লাভ করেছে। এসব পালা আমাদের প্রাচীন পুথিতে, প্রাচীন লোকনাট্যে নানাভাবে এসেছে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ও ব্রতকথায় দেবী লক্ষ্মীর স্বরূপ সম্পর্কেও জানা যায়। 'কমলামঙ্গল' কাব্যেও এই ব্রতকথা ও পাঁচালীর কাহিনি ভাগ স্থান পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য কবি যাদব দাশের 'লক্ষ্মী পাঁচালী' কাব্যর পুথিটি অনুলিপি করা হয়েছিল ১১৫০ সালের ২৩ শে ফাল্গুন মঙ্গলবারে। পুথিটি সংগ্রহ করেন শ্রী অজিতনাথ ভট্টাচার্য; মালদহের হরিশচন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কবি যাদব দাশ তাঁর নিজের সম্পর্কে কোন তথ্য কাব্য মধ্যে প্রদান করেননি। তবে তার সমসাময়িক রাজা হিসাবে ধর্মপালের নাম উল্লেখ করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের 'বিস্তৃত বাংলা পুথি' প্রথম খন্ড গ্রন্থে সংকলক শ্রী সুনীল কুমার ওঝা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি এই পুথি আজ থেকে প্রায় তিন শত বছর আগে অনুলিখিত হয়েছিল। আলোচ্য পুথিটি লেখা শুরু হয়েছে –

"অথ লক্ষ্মী পাচালি লিখ্যতে॥
ধনং ধান্যং ধরা ধর্ম্মং কীর্তিমায় যশ শ্রীয়ং।
তুব গাণ দন্তীণঃ পুত্রানং মহালক্ষ্মী পৃয়চ্ছমে।।"[৯]

নারায়ণ পত্নী দেবী লক্ষ্মীর বন্দনায় গণেশ ও সরস্বতী স্তব বন্দনার পাশাপাশি ব্যাস, অষ্টলোকপাল, দেবরাজ, চন্দ্র, সূর্য সকলকের স্তুতি করা হয়েছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের কাব্য রচনা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য কবি যাদব দাশের 'লক্ষ্মী পাঁচালী' কাব্যটিতেও দেখা যায় দেবীর নাম, কাব্য নাম সহ দেবতার স্তুতি ও লক্ষ্মীর পুজো পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী অংশে কবি দেবীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ করেছেন। ধান্য ক্ষেতে দেবীর জন্ম তাই ধানাই তাঁর নাম।। অনুরূপভাবে 'পানাই' শব্দের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন পান ক্ষেতে দেবীর জন্ম বলে দেবীর নাম পানাই। 'ধানাই পানাই' শব্দ দ্বারা চঞ্চলতাকে বোঝানো হয়েছে। এই শব্দটি মালদহের একটি প্রচলিত শব্দ। দেবী লক্ষ্মী চঞ্চলা; সে কথা বোঝাতে চাওয়ার সূত্রে দেবীর এই নামকরনের উল্লেখ। দেবী লক্ষ্মীর জন্ম বৃত্তান্ত কথা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"লক্ষ্মী অবতার তভোঁ বোলিতে না জানি॥
ধান্যখেতে যন্ম হইল জেই হইতে।
ধানাই করিঞাঁ লোক বোলে শেই হইতে॥
ধানাই পানাই কথা সুনে জেই জণ।
তাহাকে বিদৃশি দেবী নহিব কখন॥"[১০]

দেবীর এই মাহাত্ম্য কথা শুনলে ধন-সম্পত্তি, শ্রী বৃদ্ধি, পুত্র, যশ ইত্যাদি লাভ হয়। এরপর কবি উজানী নামে রাজা ধর্মপালের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, রাজা পুত্রবৎ প্রজাপালন করেন। রাজ্যে লক্ষপতি বণিক ও ব্রাহ্মণ বসবাস করে –

"উজানি নামে রাজা নামে ধর্ম্মপাল।
পুত্রবত পালে প্রজা বৈশে চিরঃকাল।।
তাহার রায়্যের লক্ষপতি শাধূ নাম।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 171
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক ব্রাহ্মণ তথা বৈশে অনুপাম॥"[১১]

সেই রাজ্যে দুজন গরীব রাখাল বসবাস করত। তারা একদিন গাভী হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন তাদের অপ্সরা কন্যাগণ বলেন শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে অগ্রহায়ণ মাসে দেবীর পূজা করতে। কারণ দেবী লক্ষ্মীর ব্রত পালন করলে হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া যায়। রাখালদের পুজোর সময় অপ্সরা বিদ্যাধরীদের আবির্ভাব ঘটে, পরে তাদের দ্বারা দেবীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করা হয়।

কাব্য মধ্যে দেখা যায় শঙ্কর বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দেন, দেবী লক্ষ্মীর জন্য বিচিত্র 'চৌচালা' ঘর নির্মাণ করতে।

"চৌচালা মণ্ডপঘর শাজাহ এখন॥
মহেশের চরণে নমস্কার করি।
কাচ চালে বিশ্বকর্মা নির্মাইল পূরি॥
বিচিত্র চৌচালা ঘর বিচিত্র প্রাঙ্গণ।"[১২]

হীরে, মুক্ত, মণি দ্বারা দেবীর পুরী নির্মাণ করা হল; সেই সঙ্গে দেবীর দুই অপ্সরীর সৃষ্টি করা হলো। আর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য সহযোগে শিবের আদেশে হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় নূতন ধান্য সহ লক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রচার করা হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মী পুজো হলেও এ কাব্যে অঘ্রাণ মাসের পূর্ণিমাতে নতুন ধান সহযোগে দেবীর আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর কাব্যে দেখা যায় দেবীর পুজোর উপদেশ দিয়ে শঙ্কর ও পার্বতী কৈলাসে গমন করেন। এই সূত্রে আমরা বলতে পারি, দেবীর পুজো প্রচলনের ক্ষেত্রে শিবের নির্দেশ দান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকটিকে চিহ্নিত করে।

কবি যাদব দাশ দেবী লক্ষী কর্তৃক নারীদের নানান নীতি শিক্ষা এই কাব্যে তুলে ধরেছেন। কলহ-বিবাদ যেখানে হয় না সেখানে দেবী অধিষ্ঠিত হন। কাব্যে উল্লেখিত নীতি শিক্ষামূলক বিষয়গুলি হল –

"দেবদ্বিজ গুরু অতিথের শেবা করে।
শর্ব্বত্র পৃয় বাক্য বোলে নিরন্তরে॥
শ্বামীর ভোষণ শেষে জাহার ভোযন।
শ্বামী শেবা জেই জণ করে অনুক্ষণ।।
গোধণের গৃহ যেবা করে পরীস্কার।
শত্যে তুষ্ট আমি তাকে কি কহিব আর।।
জেই নারী পতিব্রতা করয়ে সুমণ।
তাহার ঘরতে আমি থাকী শর্ব্বক্ষণ।।
শন্ধ্যাকালে প্রদিপ না দেয় জেই নারী।
সূর্যোদয়ে শয়ণ তাকে পরীহরি।
শ্বামির বাক্যতে উত্তর দেয় যেই জণ।
গুরু গর্বিত তার করয়ে লাঞ্ছণ ।।
অতিথ্য দেখীঞা যেবা ক্রোধ করে মণে।
তাহাক তেজিএ আমী সুণ নারায়ণে।।"[১৩]

দেবী মনসা ও চণ্ডীর মতোই এই কাব্যেও দেবী লক্ষ্মীর ভীষণা মূর্তি ধারণ এবং নানান কৌশল অবলম্বনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কাব্যে দেখা যায় এক ব্রাহ্মণ, দেবীর আশীর্বাদে ধন-যশ লাভ করে। কিন্তু সে দেবীর ব্রত না শোনার জন্য দেবীর কোপে পড়েন। কারণ দেখা যায় যে পুত্রর বিবাহ দিতে যাবার সময় ব্রাহ্মণ পথে দেবীর বিরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হল–

"লক্ষ্মীর মায়ায়ে হৈল ঘোর অন্ধকার।
ঝড় বরিশন পথে হইল শঞ্চার॥

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 171
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাত্রণ বাত্রণ শব গেল চারিভিতে।
বরকে লইঞা চোর পালায় তুরিতে॥"[১৪]

এই অংশ থেকে ব্রাহ্মণের নানা দুর্দশার কথা জানা যায়। পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে যেমন ব্রাহ্মণকে পড়তে হয় তেমনি ব্রাহ্মণের পুত্রকেও চোরের দ্বারা অপহৃত হতে হয়। তখন ব্রাহ্মণ কর্তৃক দেবীর স্তব পাঠ করা হলে দেবী লক্ষ্মী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেন যে ব্রাহ্মণ পূর্ব অবস্থা ফিরে পাবেন –

"যোড়হস্ত করি বিপ্র কহিতে লাগীল।
এই ব্রত করে জেই এই কথা সুণে।
ভক্তিভাবে পূজাবিধী কিছুই না জাণে॥
তাহাকে না ছাড়িবে তোমি জাবৎ শেই জিয়ে।
ধণ পুত্র যশ পূণ্য দিণে ২ হয়ে।।"[১৫]

দেবীর ব্রত পাঠ করলে জগৎ তথা সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। এরপর 'কুম্ভকার কাঠুরিয়া' পালায় আমরা দেখি দেবী কুম্ভকার ও কাঠুরিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যদি একদিনের উপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করে তাহলে শাপ মুক্ত হবে–

"একদিণের বিক্রী জদি ব্রাহ্মণে করে দান।
তবে শাপ্যতে দূহার হইবে পরিত্রাণ।"[১৬]

দেবী কর্তৃক উপদেশ বার্তাও আমরা লক্ষ করি –

"বৃক্ষের কথা তোমাকে কহিব নিশ্চয়।
শিষ্যকে না দিলে বিদ্যা তাকে হেণ হয়।
তাহার গোড়াতে শূবর্ণ্ন পোতা আছে।
তাহা দান কৈলে ফল খাইবে মানুশে।"[১৭]

কাব্য আখ্যান থেকে জানা যায় যে দেবীর ব্রত পালনকারীর অসম্মান হলে মানুষকে ব্রতীর রোষে পড়তে হয়। এরকম ভাবে শিকলির আকারে কবি বেশ কয়েকটি আখ্যানের সূত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। দেখা যায় একদা এক কচ্ছপ 'শাতেশ্বরী হার' ভক্ষণ করার জন্য দেবীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়। তবে মুক্তির উপায় স্বরূপ জানা যায় যে ব্রাহ্মণকে সেই হার দান করলে শাপ থেকে মুক্তি পাবে। আদেশ অনুসারে কচ্ছপ সেই হার ব্রাহ্মণকে প্রদান করে। তখন ব্রাহ্মণ সেই হার গলায় দিয়ে যাবার সময় পথে গজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন ব্রাহ্মণ কর্তৃক কচ্ছপের শাপ মুক্তির কাহিনি পরিবেশিত হয় ও সেই সঙ্গে অভিশপ্ত দুই কন্যার কথাও গজকে ব্রাহ্মণ জানালে গজ নিজের পিঠে করে তাদের কাছে ব্রাহ্মণকে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়। অনেক পথ অতিক্রম করে অভিশপ্ত দুই কন্যার সন্ধান পান ব্রাহ্মণ। তখন ব্রাহ্মণ বলে –

"কণ্যাকে দেখীঞাঁ বিপ্র কি বোলে বচণ।
ব্রতির শাপ্যে তোমরা দুষখ পাঅ দুইযণ।
আপণাকে দাণ কর ব্রাহ্মণে দুইযণ॥"[১৮]

এরপর দুই কন্যা নিজেদের ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করলে ব্রাহ্মণ তাদের সঙ্গী করে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন –

"আপণাকে দুই কণ্যা উৎসর্গীঞা দিল।
দুই কণ্যা লঞা বিপ্র গজে আরোহিল।"[১৯]

এরপর যাত্রাপথে আবার মালিনীকে শাপ মুক্ত করে বিপ্র বলে –

"ব্রতিগণ তোমার পূষ্পে শুখ না পাইল।
ক্রোধ করি ব্রতি মেলি তোমাকে সাঁপিল।।
একদিণের বিক্রি যদি ব্রাহ্মণে কর দাগ।
তবে সাপ্য হইতে তোমি পাইবা পরিত্রাণ॥"[২০]

এরপর ব্রাহ্মণ বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বন্ধু তাকে স্বাগত জানায় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 171
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ব্রাহ্মণ দেখিঞাঁ শাধু হরশীত মন।
দুই মিত্রে আনন্দে করিল আলিঙ্গণ।।"[২১]

ব্রাহ্মণকে পেয়ে সাধু গহে অনেকে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ বলে –

"সভা বসাইঞা শেই বোলিল ব্রাহ্মণ।
ময়ূরে গিলিল হার লক্ষীর কারণ।
লক্ষীর আঙ্গায়ে হার ময়ূরে গীলিল।
না জানিঞা লোক শব আমারে দূষিল।
ব্রাহ্মণে বোলিল হার দেহত ময়ূরে।
সভামধ্যে দেহ হার হউক বিচারে।।
বাহ্মণের বোলে হার উগলিঞাঁ দিল।
অদ্ভুত দেখিঞাঁ লোক জয় ২ দিল।"[২২]

মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে দেবীর নীতিমূলক উপদেশ এই কাব্যে স্থান লাভ করেছে। লক্ষীর কৃপায় ব্রাহ্মণের শ্রী বৃদ্ধির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে –

"কেহো স্নান করাইল কেহো বস্ত্র দিল।
কোণো ২ জণে আসি অলঙ্কার দিল।
ঘর দ্বার শাজাইল কোণো ২ জনে।
জে নাহি শেহো যণ আশিঞাঁ আপণে॥
লক্ষীর কৃপাএ তার শকল পূর্ণ হৈল।"[২৩]

এর মধ্যে দিয়ে কবি নিপুন ভাবে পাঁচালীর আকারে দেবীর মাহাত্ম্য কথাকে অঙ্কন করেছেন। দেবী লক্ষীর পাঁচালী শ্রবণ করলে দারিদ্রতা দূর হয়, সুখ ও শ্রী বৃদ্ধি সাধিত হয় –

"যেবা কহে জেবা সুণে লক্ষীর পাচালি।
যন্মে ২ সুখে জায় বাড়ে ঠাকুরালি॥
ভক্তি করিঞা যদি লক্ষীকে পূজয়।
দরিদ্রতা দূর জায় লক্ষী কৃপা হয়।"[২৪]

দেবী লক্ষীর পাঁচালীগুলির আখ্যান ভাগ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা লক্ষী দেবীর পাঁচালীগুলিতে যে আখ্যান সাধারণত পাই তা হল– ভাদ্র-লক্ষীর উপাখ্যান বা পেঁচা-পেচীর সংবাদ, আশ্বিন-লক্ষীর উপাখ্যান বা কোজাগরী উপাখ্যান, কার্তিক-লক্ষীর উপাখ্যান বা রাজকন্যা পুষ্পবতীর সংবাদ, অগ্রহায়ণ-লক্ষীর উপাখ্যান বা ব্রাহ্মণ শিশুর কাহিনি, পৌষ-লক্ষীর উপাখ্যান বা ভ্রাতার উপকথা, চৈত্র-লক্ষীর উপাখ্যান বা তিলফুলের কাহিনি, জগৎশেঠের উপাখ্যান, বিনন্দ রাখালের উপাখ্যান, তিলোত্তমার উপাখ্যান, লক্ষী ও সরস্বতী কলহ কাহিনি, রতা ঠাকুরের উপাখ্যান ইত্যাদি। এই উপাখ্যানগুলির আখ্যান মঙ্গলকাব্যের কবিরদের হাতে অপূর্ব ছন্দময় রূপে সুনিপুণ দক্ষতায় যথাযথ রূপ লাভ করেছে। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে পাঁচালীর বিনির্মান ঘটেছে মঙ্গলকাব্যে। আমরা কবি দয়ারামের ও নিত্যানন্দের কাব্যেও পাঁচালীর আখ্যান ভাগের সাদৃশ্য দেখতে পাই। আর আমাদের আলোচ্য কাব্যটির মধ্যে শিকলি আকারে অনেকগুলি কাহিনিকে সূত্রাকারে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে কবি যাদব দাশের দক্ষতার পরিচয় যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি লক্ষী দেবীর স্বরূপ নির্মানেও কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাহিনির বয়নে গ্রামীণ মানুষের জীবন কথা, নানা লোকাচার, ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানের কথাও প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্য লোকায়ত জীবনের কাব্য। এই সব কাব্যকে লোকসংস্কৃতির পাঠক্রমেও যুক্ত করা দরকার। লক্ষী পুজোর সময় এসব কাব্য কাহিনি আজও পাঠ করা হয়। 'কমলামঙ্গল' কাব্য ধারায় এই আখ্যানটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন একথা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, পৃ. ৮-৯
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-২০১৬, পৃ. ৩৮
৩. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ. ১৭৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৫, পৃ. ৮৩-৮৪
৫. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, বৈশাখ ১৩৯৬, পৃ. ১৪-১৫
৬. তদেব, পৃ. ১৮
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ৭০০০০৬, পুণর্মুদ্রণ ১৪২০, পৃ. ২০
৯. ওঝা, সুনীল কুমার, (সংকলিত), 'বিস্তৃত বাংলা পুথি' (প্রথম খণ্ড), বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃ. ২
১০. তদেব, পৃ. ৪
১১. তদেব, পৃ. ৪
১২. তদেব, পৃ. ৬
১৩. তদেব, পৃ. ৮
১৪. তদেব, পৃ. ৯
১৫. তদেব, পৃ. ১০
১৬. তদেব, পৃ. ১০
১৭. তদেব, পৃ. ১০
১৮. তদেব, পৃ. ১১
১৯. তদেব, পৃ. ১২
২০. তদেব, পৃ. ১২
২১. তদেব, পৃ. ১২
২২. তদেব, পৃ. ১২
২৩. তদেব, পৃ. ১৩
২৪. তদেব, পৃ. ১৩